ধানের পাঁচটি প্রধান রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

রচনা ও সম্পাদনায়

ড. মোঃ আব্দুল লতিফ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

মোঃ শাহজাহান কবির, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ড. নিত্য রঞ্জন শর্মা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১

প্রকাশনা নং ঃ ১৭০
প্রথম সংস্করণ ঃ ৫,০০০ কপি
মে ২০০৭

প্রকাশক

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর ১৭০১

মুদ্রণে

জনতা প্রিন্টিং প্রেস
মুন্সিপাড়া রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর

অর্থায়নে

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
খামার বাড়ী, ঢাকা

যোগাযোগ

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ এবং
প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর ১৭০১

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	০১
সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনা	০২
বাকানি	০৩
ব্লাস্ট	০৭
পাতাপোড়া	১২
উফরা	১৮
টুংরো	২৩

মুখবন্ধ

ধান বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান খাদ্য শস্য। ধান উৎপাদনের দিক থেকে এশিয়ায় বাংলাদেশের স্থান চতুর্থ। ধানের সাথে রয়েছে এ দেশের মানুষের নাড়ীর টান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে ধানের ফলন অত্যন্ত কম। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে তম্মধ্যে ধানের রোগবালাই অন্যতম। আমাদের দেশে রোগবালাইয়ের কারণে শতকরা ১০-১৫ ভাগ ফলন নষ্ট হয়। বাংলাদেশে ধানের মোট ৩২টি রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে দশটি প্রধান রোগ হিসেবে চিহ্নিত যা বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জাতের ধানে আক্রমণ করে থাকে। তবে এ দশটির মধ্যে বাকানী, ব্লাস্ট, পাতাপোড়া, উফরা ও টুংরো অন্যতম। ধানের যে কোন নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হলে এ রোগগুলোর বিরুদ্ধে ঐ জাতের প্রতিরোধ ক্ষমতা কতটুকু আছে তা গবেষণার মাধ্যমে জেনে নিতে হয়। কারণ আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এসব রোগের যে কোনটি আক্রমণ প্রবণ জাতের ধানে অতি দ্রুত মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানের ক্ষতিকর রোগবালাই নিয়ন্ত্রণে রেখে অধিক ফলন অর্জন করা সম্ভব। এমনকি শুধুমাত্র ভাল জাতের ভাল বীজ ও দু'তিন কিস্তিতে পরিমিত ইউরিয়া সারসহ অন্যান্য সার সুষম মাত্রায় ব্যবহার করে অনেক রোগবালাইয়ের আক্রমণ ও ক্ষতি বহুলাংশে কমানো যায়। সেই সাথে পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ ও সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভাল ফলন নিশ্চিত করা যায়। সে লক্ষ্যে ক্ষতিকর পাঁচটি প্রধান রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা সমন্ধে এ পুস্তিকায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায় এটি ব্যবহার করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষক ভাইগণ উপকৃত হবেন।

ড. মোঃ নূর-ই-এলাহী
মহাপরিচালক

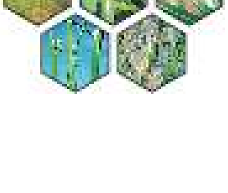

সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনা কি ?

সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনা বলতে পরিবেশকে দূষনমুক্ত রেখে একাধিক দমন ব্যবস্থাপনা গ্রহণের মাধ্যমে ফসলের রোগকে অর্থনৈতিক ক্ষতি সীমার নিচে রাখাকে বুঝায়। সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনার উপাদানগুলো হলোঃ

ক) সুস্থ বীজের ব্যবহার
খ) রোগ প্রতিরোধী জাতের ব্যবহার
গ) পরিচর্যা পদ্ধতি বা আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি
ঘ) ভৌতিক বা যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা
ঙ) জৈবিক ব্যবস্থাপনা
চ) রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা

এখানে উল্লেখ্য যে, ক-ঙ পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে যদি রোগ দমন করা সম্ভব না হয় কেবল তখনি রাসায়নিক পদ্ধতি অণুমোদিত গাইড লাইন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ধানের মোট ৩২টি রোগ সনাক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে ১০টি মূখ্য রোগ বাকী ২২টি গৌণ। এ রোগগুলি দ্বারা ধানের ফলন শতকরা ১০-১৫ ভাগ কম হয়। উক্ত রোগগুলি সাধারনতঃ ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, কৃমি, ভাইরাস ও মাইকোপ্লাজমা দ্বারা সংগঠিত হয়। নিম্নে ধানের প্রধান ৫টি রোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো।

বাকানি (Bakanae)

বাকানি রোগ সর্বপ্রথম ১৮২৮ সালে জাপানে সনাক্ত করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের ধান উৎপাদনকারী সকল দেশেই এ রোগ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সব জায়গায়ই কম বেশি এ রোগটি দেখা যায়। বিভিন্ন জায়গায় এ রোগ হিসকা, বিজাত ইত্যাদি নামে পরিচিত।

রোগের গুরুত্ব

আমাদের দেশে এ রোগটি প্রধান রোগ হিসাবে পরিচিত। বিগত কয়েক বছর পূর্বে এ রোগটি ততটা ব্যাপক ছিল না। কিন্তু ইদানিং বৃহত্তর কুমিল্লা ও সিলেট জেলায় ব্যাপক আকারে দেখা যাচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে ফলনেও ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাকানি আক্রমণের ফলে ফসলে শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত ক্ষতি হতে পারে।

রোগের কারণ

এক ধরনের ছত্রাক দ্বারা ধান গাছে বাকানি রোগ হয়ে থাকে যার নাম *ফিউজেরিয়াম মনিলিফরমি (Fusarium moniliforme)*। এ ছত্রাক জিবেরিলিন নামক এক ধরনের হরমোন নিঃস্বরণ করে যা গাছের দ্রুত অঙ্গজ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

রোগের বাহক

বীজ বাকানি রোগের অন্যতম বাহক। মাটি, পানি, বাতাসের মাধ্যমেও এ রোগের জীবাণু এক জমি হতে অন্য জমিতে ছড়ায়।

রোগের প্রাথমিক উৎস

এ রোগের জীবাণু বীজ, মাটি ও রোগাক্রান্ত পুরানো গাছের অংশ অথবা আশপাশের আক্রান্ত জমি হতে প্রাথমিকভাবে এসে থাকে।

রোগের অনুকূল অবস্থা

আক্রমণ প্রবণ ধানের জাত চাষ করলে এ রোগ বেশি হয়। রোগাক্রান্ত বীজ দ্বারা ধান চাষ করলে এবং মাটিতে আগে থেকেই এ রোগের জীবাণু থাকলে ধান গাছে এ রোগ হয়। অতিরিক্ত ইউরিয়া সারের প্রয়োগে এ রোগের আক্রমণ বাড়তে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রায়ও (৩০-৩৫° সেলসিয়াস) এ রোগের আক্রমণ বেশী হয়।

ধান গাছের আক্রমণ প্রবণ পর্যায়

বাকানি রোগ ধান গাছের চারা অবস্থা থেকে শুরু করে থোড় আসা পর্যন্ত যে কোন সময়ে হতে পারে। তবে চারা অবস্থায় হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ

বাংলাদেশে সকল মৌসুমেই বাকানি রোগ হয়ে থাকে। কিছু দিন পূর্বে আউশ মৌসুমেই এ রোগ বেশি দেখা যেত, বর্তমানে তিন মৌসুমেই প্রায় সমানভাবে দেখা যায়।

ছবি ১

ছবি ২

এ রোগে আক্রান্ত চারা (ছবি ১) বা কুশি (ছবি ২) স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক লম্বা, চিকন ও লিকলিকে হয়ে যায়। দেখতে হালকা সবুজ রঙের ও দুর্বল মনে হয়। কোন কোন সময় গাছের গোড়ার দিকে গিঁট হতে শিকড় বের হতে দেখা যায় (ছবি ৩)। ধীরে ধীরে আক্রান্ত গাছ শুকিয়ে মরে যায় (ছবি ৪ এবং ৫)। চারা অবস্থায় বা রোপনের পরপরই এ রোগে আক্রান্ত হলে আক্রান্ত গাছে কোন ফলন হয় না। তবে গর্ভাবস্থায় এ রোগ হলে চিটা এবং অপুষ্ট ধান বেশি হয় এবং শীষ অনেক ছোট হয়।

ছবি ৩

ছবি ৪

ছবি ৫

রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

ক) রোগাক্রমণের আগে করণীয়

- রোগ সহনশীল ধানের জাত যেমন বিআর১৪, ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ব্রি ধান৪৪ ও ব্রি ধান৪৫ ইত্যাদির চাষ করা।
- সুস্থ বীজের ব্যবহার- রোগমুক্ত জমি হতে বীজ সংগ্রহ করে ঐ বীজ দ্বারা ধান চাষ করা। যে সমস্ত এলাকায় বাকানি রোগ বেশি হয় সে সমস্ত জায়গা হতে বীজ সংগ্রহ না করা।
- বীজ শোধন- ব্যাভিস্টিন বা নোইন হেডাজিম, টপসিল প্লাস এবং সানফানেট নামক ঔষধ প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম মিশিয়ে এক রাত ভিজিয়ে বীজ শোধন করে নিলে এ রোগ হবে না।
- চারা শোধন- জমির পার্শ্বে আইল দিয়ে ঘিরে ব্যাভিস্টিন বা নোইন বা হেডাজিম নামক ছত্রাক নাশক প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে এক রাত চারা শোধন করে লাগানো।
- একই জমি বার বার বীজতলার জন্য ব্যবহার না করা।
- ভেজা বীজ তলার চারায় এ রোগ কম হয়। শুকনা বীজতলার চারা উঠানোর সময় চারার অধিকাংশ শিকড় ছিড়ে যায়, যার ফলে এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে; তাই শুকনা বীজতলা হতে চারা উঠানোর পূর্বে ৩-৪ দিন ভিজিয়ে চারা উঠানো।
- শস্য পর্যায়- জমিতে একই মৌসুমে একই জাতের ধানের চাষ না করে ভিন্ন জাতের ধান অথবা অন্য ফসলের চাষ করা।
- সুষম সার প্রযোগ- সুষম মাত্রায় ইউরিয়া সার ব্যবহার করেও এ রোগের প্রকোপ কমানো যেতে পারে।

খ) রোগাক্রান্ত মাঠে করণীয়

- বীজতলা হতে চারা তোলার সময় রোগাক্রান্ত চারা বেছে ফেলে দিতে হবে।
- চারা রোপনের পর এ রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে নষ্ট করে দিতে হবে।

ব্লাস্ট (Blast)

বিশ্বের অন্যতম ধান উৎপাদনকারী দেশ চীনে ১৬৩৭ সালে সর্বপ্রথম ধানের ব্লাস্ট রোগ সনাক্ত করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন ধান উৎপাদনকারী দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বাংলাদেশের সকল জেলায় এ রোগ হলেও বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও বরিশাল জেলায় বেশি দেখা যায়।

রোগের গুরুত্ব

বাংলাদেশে এটি ধানের একটি প্রধান রোগ হিসেবে পরিচিত। অনুকূল আবহাওয়া এবং ব্যাপক এলাকায় রোগ সংবেদনশীল জাত চাষ করলে অনেক সময় এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দিতে পারে। তখন এ রোগ ধানের ফলনের শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত ক্ষতি করতে পারে।

রোগের কারণ

পাইরিকুলারিয়া গ্রিসিয়া (Pyricularia grisea) নামের একটি ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের বাহক

ব্লাস্ট রোগ বীজের মাধ্যমে এক মৌসুম হতে অন্য মৌসুমে ছড়ায়। তাছাড়া রোগাক্রান্ত গাছের জীবাণু বাতাস ও পোকার মাধ্যমেও এক জমি হতে অন্য জমিতে ছড়িয়ে পড়ে।

রোগের প্রাথমিক উৎস

রোগাক্রান্ত বীজ ও আশপাশের আক্রান্ত গাছ থেকেও এ রোগের জীবাণু এসে থাকে।

রোগের অনুকূল অবস্থা

সংবেদনশীল ধানের জাত চাষ করলে ব্লাস্ট রোগ বেশি হয়। বেলে মাটিতেও এ রোগ বেশী হয়। জমিতে মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া সার এবং প্রয়োজনের তুলনায় কম পটাশ সার দিলে এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়। দীর্ঘদিন জমি শুকনা অবস্থায় থাকলেও এ রোগের আক্রমণ হতে পারে। তাছাড়া রাতে ঠান্ডা, দিনে গরম ও সকালে পাতায় শিশির জমা হলে এ রোগ দ্রুত ছড়ায়।

ধান গাছের আক্রমণ প্রবণ পর্যায়

ব্লাস্ট রোগটি ধান গাছের চারা অবস্থা থেকে শুরু করে ধান পাকা পর্যন্ত যে কোন সময়ে হতে পারে। তবে চারা এবং ফুল আসা অবস্থায় এ রোগের আক্রমণের প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়।

রোগের লক্ষণ

এ রোগ ধানের সকল মৌসুমেই হয়ে থাকে। তবে বোরো মৌসুমে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। সাধারনত এ রোগ ধান গাছের পাতা, গিঁট ও শীষে আক্রমণ করে থাকে। গাছের আক্রান্ত অংশের উপর ভিত্তি করে এ রোগ তিনটি নামে পরিচিত যেমন-পাতা ব্লাস্ট, গিঁট ব্লাস্ট ও শীষ ব্লাস্ট।

পাতা ব্লাস্ট ঃ পাতায় প্রথমে ডিম্বাকৃতির ছোট ছোট ধূসর বা সাদা বর্ণের দাগ দেখা যায় (ছবি ৬)। দাগগুলোর চারিদিক গাঢ় বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে। পরবর্তীতে এ দাগ ধীরে ধীরে বড় হয়ে চোখের আকৃতি ধারণ করে (ছবি ৭), অনেকগুলি দাগ একত্রে মিশে পুরো পাতাটাই মেরে ফেলতে পারে (ছবি ৮)। এ রোগে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হলে জমিতে মাঝে মাঝে পুড়ে যাওয়ার মত মনে হয় (ছবি ৯)। অনেক ক্ষেত্রে খোল ও পাতার সংযোগস্থলে কাল দাগের সৃষ্টি হয়। যা পরবর্তিতে পঁচে যায় এবং পাতা ভেঙ্গে পড়ে।

ছবি ৬

ছবি ৭

গিঁট ব্লাস্ট ঃ ধান গাছের থোড় বের হওয়ার পর থেকে এ রোগ দেখা যায়। গিঁটে কালো রংয়ের দাগ সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে এ দাগ বেড়ে গিঁট পচে যায়, ফলে ধান গাছ গিঁট বরাবর ভেংগে পড়ে (ছবি ১০)।

ছবি ৮

ছবি ৯

ছবি ১০

শীষ ব্লাস্ট ঃ এ রোগ হলে শীষের গোড়া অথবা শীষের শাখা প্রশাখার গোড়ায় কাল দাগ হয়ে পঁচে যায় এবং শীষ অথবা শীষের শাখা প্রশাখা ভেংগে পড়ে (ছবি ১১)।

ছবি ১১

রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

ক) রোগাক্রামণের আগে করণীয়

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের চাষ করা - বোরো মৌসুমে বিআর৩, বিআর১৪, বিআর১৬ ও ব্রি ধান৪৫, আউশ মৌসুমে বিআর৩, বিআর১৫, বিআর২০, বিআর২১, ব্রি ধান৪৩; আমন মৌসুমে বিআর৫, বিআর১০, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৪৪ লাগানো।
- সুস্থ্য বীজের ব্যবহার- সুস্থ গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করা, দাগী বা অপুষ্ট বীজ বেছে ফেলে দিয়ে সুস্থ বীজ ব্যবহার করা।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা-আক্রান্ত জমির খড়কুটা পুড়িয়ে ফেলা এবং ছাঁই জমিতে মিশিয়ে দেওয়া।

- বীজশোধন- থায়োফানেট মিথাইল নামক কার্যকরী উপাদান বিশিষ্ট ছত্রাকনাশক ১ লিটার পানিতে ৩ গ্রাম মিশিয়ে ১০-১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে বীজ শোধিত হয়। এই শোধিত বীজ লাগালে বীজতলায় চারা অবস্থায় পাতা ব্লাস্ট কম হবে।
- সুষম সার প্রয়োগ- সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করা এবং আক্রান্ত জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ বন্ধ রাখা। পটাশিয়ামের অভাবযুক্ত জমিতে পর্যাপ্ত পটাশ সার অথবা আমাদের দেশের কৃষকের প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী ছাই ব্যবহার করা। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরিপ্রয়োগ করা।

খ) রোগাক্রান্ত মাঠে করণীয়

- বীজতলা অথবা মাঠে রোগ দেখা মাত্র জমিতে পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ করা।
- আক্রান্ত জমিতে হেক্টর প্রতি ৮০০ মিলি লিটার (বিঘা প্রতি ১০০ মিলি লিটার) হিনোসান অথবা হেক্টর প্রতি ২.৫ কেজি (বিঘা প্রতি ৩০০ গ্রাম) বেনলেট বা টপসিন এম স্প্রে করা।

এ রোগ বাংলাদেশে কোন কোন এলাকায় ধান উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এ রোগের উৎপত্তি এবং বিস্তারের প্রধান কারণ হলো আবহাওয়া। চাষী ভাইয়েরা যদি এ রোগের অনুকূল আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে পারে তবেই এ রোগকে উপরোক্ত সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দমন করে অধিক ফলন ঘরে আনতে পারবে।

পাতাপোড়া (Bacterial Blight)

১৮৮৪ সালে জাপানে পাতাপোড়া রোগ সনাক্ত করা হয়। রোগটি এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে দেখা যায়। রোগটি এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেখানে ধানের চাষাবাদ খুব নিবিড়ভাবে হয় সেখানেই ব্যাপক ভাবে দেখা যায়। বাংলাদেশে রোগটি ১৯৬৬ সালে প্রথম সনাক্ত করা হয়। রোগটি আউশ, আমন ও বোরো এ তিন মৌসুমেই ব্যাপকভাবে দেখা যায়। বাংলাদেশের সকল এলাকায় এ রোগ দেশী ও উচ্চফলনশীল (উফশী) জাতে হয়ে থাকে।

রোগের গুরুত্ব

ধানের প্রধান দশটি রোগের মধ্যে পাতা পোড়া একটি অন্যতম রোগ। এ রোগের কারণে বিভিন্ন দেশে ধানের ফলন জাতভেদে গড়ে শতকরা ২০-৩০ ভাগ কম হয়। গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে এর কারণে ফলন ৭০% পর্যন্ত কমতে দেখা গেছে। এ রোগ ফলন ঘাটতির সাথে সাথে ফসলের গুনগতমানেরও ক্ষতিসাধন করে।

রোগের কারণ

পাতাপোড়া রোগ এক ধরনের ব্যাকটেরিয়াম, *জ্যানথোমোনাস অরাইজি পিভি অরাইজি (Xanthomonas oryzae pv. oryzae)* এর আক্রমণে হয়ে থাকে।

রোগের বাহক

পাতাপোড়া রোগ পোকা, বাতাস ও সেচের পানির মাধ্যমে এক জমি থেকে অন্য জমিতে ছড়ায়।

রোগের প্রাথমিক উৎস

ধানের খড়, মাটি, সেচের পানি বা দূরের আক্রান্ত গাছ যা হতে রোগজীবাণু পোকা, পানি, বৃষ্টির ছিটা বা বাতাসের মাধ্যমে সুস্থ গাছে আসে।

রোগের অনুকূল অবস্থা

গাছ আক্রমণ প্রবণ জাতের হলে এ রোগ সবচেয়ে বেশি হয়। এ ছাড়া কুশি গজানো অবস্থায় ইউরিয়া সার বেশি দিলে, আশেপাশে রোগের উৎস থাকলে, চারা উঠানোর সময় শিকড়ে ক্ষত হলে, উচ্চ তাপমাত্রা (২৬-৩০° সেঃ) ও বাতাসে অত্যাধিক আর্দ্রতা (৭০% এর উপরে) থাকলে, ঝড়ো হাওয়া, ঘূর্ণিঝড় বা অত্যাধিক বৃষ্টির ফলে পাতায় ক্ষত হলে এ রোগ বেশি হয়ে থাকে।

ধান গাছের আক্রমণ প্রবণ পর্যায়

গাছের সকল অবস্থায় এ রোগ হয়ে থাকে। চারা অবস্থায় কৃসেক এবং বয়স্ক গাছে সর্বোচ্চ কুশি গজানো অবস্থা থেকে শুরু করে পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত পাতাপোড়া রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ

পাতাপোড়া রোগ চারা এবং বয়স্ক গাছে তিন ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি করে। লক্ষণ গুলি নিম্নরূপ ঃ

ক) কৃসেক- চারা ও কুশি অবস্থায় সাধারণত কৃসেক লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ রোগের কারণে গাছটি প্রথমে নেঁতিয়ে পড়ে ও আস্তে আস্তে পুরো গাছটি মারা যায় (ছবি ১২)। আক্রান্ত গাছের কান্ড ছিড়ে চাপ দিলে বা চারাটি গোড়ার দিকে ভেংগে দু'আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলে পুঁজের মতো খুব দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ বের হয়।

ছবি ১২

খ) ফ্যাঁকাশে হলুদ পাতা- আক্রান্ত গাছের কচি পাতা ফ্যাঁকাশে হলুদ হয়ে অবশেষে শুকিয়ে মারা যায়। সাধারণত দিবা রাত্রির তাপমাত্রার পার্থক্য ৮-১০° সেঃ এর বেশি হলে এ লক্ষণ দেখা যায় (ছবি ১৩)। আমাদের দেশে কদাচিৎ এ লক্ষণ দেখা যায়।

ছবি ১৩

গ) পাতাপোড়া- ধান গাছের কুশি বা তার পরবর্তী পর্যায়ের যে কোন সময়ে পাতাপোড়া লক্ষণ দেখা যায়। প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে পাতার যে কোন স্থানে বা বিশেষ করে অগ্রভাগে বা কিনারায় নীলাভ পানিচোষা দাগ দেখা যায় (ছবি ১৪)। দাগগুলো আস্তে আস্তে হালকা হলুদ রং ধারণ করে পাতার অগ্রভাগ থেকে নীচের দিকে বাড়তে থাকে (ছবি ১৫)। শেষের দিকে আংশিক বা সম্পূর্ণ পাতা ঝলসে যায় ফলে জমিতে গাছের পাতা ধূসর বা শুকনো খড়ের রং ধারণ করে (ছবি ১৬)। অনেক সময় এ রোগের লক্ষণের অগ্রভাগ দিয়ে ব্যাকটিরিয়ার কোষগুলো বেরিয়ে আসে এবং কোষগুলো একত্রে মিলিত হয়ে ভোরের দিকে হলদে পুঁতির দানার মত গুটিকা সৃষ্টি করে এবং এগুলো শুকিয়ে শক্ত হয়ে পাতার গায়ে লেগে থাকে (ছবি ১৭)। পরবর্তীকালে পাতার গায়ে লেগে থাকা জলকণা গুটিকাগুলোকে গলিয়ে ফেলে, ফলে এ রোগের জীবাণু অনায়াসে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগের কারণে শিষ বের হতে পারে না বা বের হলেও ধান চিটা বা আংশিক অপুষ্ট হয় এবং ফলনের অনেক ক্ষতি হয়।

ছবি ১৪

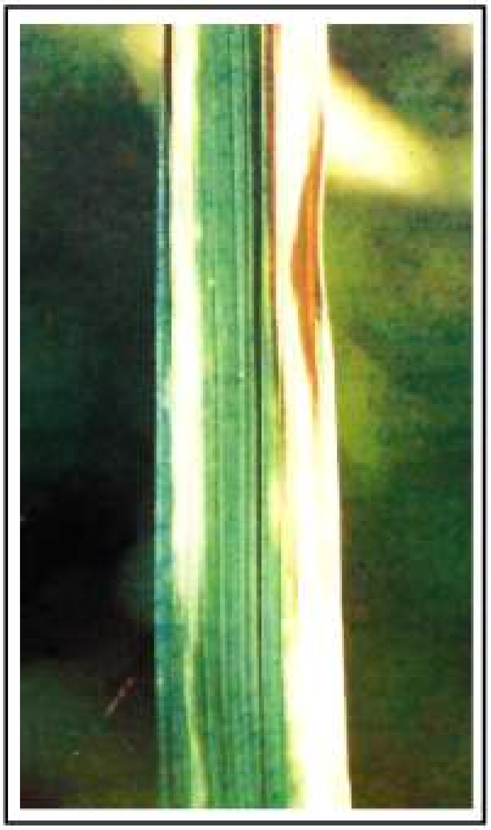

ছবি ১৫

ছবি ১৬

ছবি ১৭

রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

ক) রোগাক্রামণের আগে করণীয় ঃ

- রোগ প্রতিরোধী জাতের ব্যবহার পাতাপোড়া রোগকে অনেকগুনে কমিয়ে রাখে। সে লক্ষে বোরো মৌসুমে বিআর২, বিআর১৪, বিআর১৬ ও ব্রি ধান৪৫; আউশ মৌসুমে বিআর২৬ ও ব্রি ধান২৭ এবং আমন মৌসুমে বিআর৪, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৪ ও ব্রি ধান৪৬ এর চাষ করা।

- সার ব্যবস্থাপনা- সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার ও ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করা।

- চারা উঠানোর সময় যেন শিকড় কম ছিড়ে ।
- পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা- ধান কাটার পর জমিতে নাড়া ও খড় পুঁড়িয়ে ফেলা। যাতে করে পরবর্তী ফসলে আর এ রোগ দেখা দিতে না পারে ।

খ) রোগাক্রান্ত মাঠে করণীয় ঃ

- পানি ও সার ব্যবস্থাপনা- ঝড় ও অত্যাধিক বৃষ্টির পর ইউরিয়া সার না দেয়া, রোগ দেখার পর ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ বন্ধ করা।
- পাতাপোড়া বা কৃসেক লক্ষণ দেখা দিলে জমির পানি শুকিয়ে ৭-১০ দিন পর আবার পানি দেয়া এবং সে সঙ্গে বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার ছিঁপছিঁপে পানিতে প্রয়োগ করা।

উফরা (Ufra)

১৯১৩ সালে বাটলার নামক এক বিজ্ঞানী, নোয়াখালি জেলায় এ রোগ সনাক্ত করেন। বিভিন্ন এলাকায় এ রোগ উর্বা, ডাকপোড়া, জ্বলে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, লোনা লাগা ইত্যাদি নামে পরিচিত। বৃহত্তর বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, কুমিল্লা, সিলেট, খুলনা ও ঢাকা জেলায় এ রোগ দেখা যায়।

রোগের গুরুত্ব

প্রাথমিকভাবে এ রোগটি জলী আমন ধানে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে জলী আমন ধানের জমির পরিমান হ্রাসের সাথে সাথে

এ রোগটি রোপা আমন, বোরো এমনকি আউশ ধানেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি বছর প্রায় দুই লক্ষ হেক্টর জমির ধান উফরা রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারনতঃ শতকরা ৪০-১০০ ভাগ ফলন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

রোগের কারণ

ডাইটিলেঙ্কাস এ্যাংগাছটাস (Ditylenchus angustus) নামক এক ধরনের কৃমি দ্বারা এ রোগ হয়।

রোগের বাহক ও প্রাথমিক উৎস

ফসল কাটার পর আক্রান্ত গাছের কৃমি কুন্ডলী পাকিয়ে অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে। আক্রান্ত জমির পরিত্যক্ত নাড়া, খড়কুটা, শিষের অংশ বা ঝরে যাওয়া ধানে এবং মাটিতে কোন খাদ্য ছাড়াই এ কৃমি কুন্ডলী পাকিয়ে ৬-৮ মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। তাছাড়া আক্রান্ত ক্ষেতে ঝরা ধান থেকে অঙ্কুরিত চারায় বা কুশি ধানে এবং পোষক ঘাসে এ কৃমি স্বাভাবিক অবস্থায় বেঁচে থাকে।

অনুকূল অবস্থা ও বিস্তার পদ্ধতি

শুকনো আবহাওয়া ও কম তাপমাত্রার জন্য বোরো ধানে এ রোগের প্রকোপ কিছুটা কম হয়। বাতাসের তাপমাত্রা ২৮-৩০ ডিগ্রী সেঃ, বায়ুর আর্দ্রতা শতকরা ৭০ ভাগের বেশি, ঘন ঘন বৃষ্টি ও জমিতে পানি জমে থাকা এ রোগের জন্য বিশেষ উপযোগী। প্রাথমিক উৎস থেকে কৃমি বৃষ্টি, সেচ অথবা বন্যার পানিতে বের হয়ে আসে এবং ধানগাছে আক্রমণ করে। এসব আক্রান্ত গাছ থেকে কৃমি একই জমির সুস্থ গাছে কিংবা অন্য জমিতে পানির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ধান গাছের আক্রমণ প্রবণ পর্যায়

চারা ও কুশি গজানোর সময় গাছ আক্রান্ত হলে ক্ষতি ব্যাপক হয়।

লক্ষণ

কৃমি ধান গাছের কচি পাতার গোড়ার দিকের রস শুষে খায়, ফলে পাতা ও খোলের সংযোগস্থলে সাদা ছিটা-ফোটা দাগ দেখা দেয় (ছবি ১৮)।

ছবি ১৮

আক্রমণ বেশি হলে ডিগ পাতা পুরাটাই সাদা হয়ে যেতে পারে (ছবি ১৯)। সাদা দাগ ক্রমে বাদামী রঙের হয় এবং পরে এ দাগ বেড়ে সম্পূর্ণ পাতাটাই শুকিয়ে ফেলে। ফলে অনেক সময় থোড় হতে ছড়া বের হতে পারে না বা বের হলেও অর্ধেক বা আংশিক বের হয়। তবে ধান খুব চিটা ও অপুষ্ট হয়। ছড়া বের হতে না পারলে তা ভিতরে মোচড়ানো অবস্থায় থাকে (ছবি ২০)।

ছবি ১৯

ছবি ২০

আক্রান্ত গাছ সুস্থ গাছের তুলনায় কিছুটা বেঁটে হয়। আক্রমণ বেশি হলে জমিতে তেমন কোন ফলন হয় না (ছবি ২১)।

ছবি ২১

রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

ক) রোগাক্রামণের আগে করণীয় ঃ

- রোগ প্রতিরোধশীল জাতের চাষ- উফরা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এমন কোন উফশী ধান এখনও পাওয়া যায়নি। তবে রায়দা এবং বাজাইল জাতীয় স্থানীয় জলী আমন ধানে প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা- রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর নাড়া ও খড় জমিতে পুড়ে ফেলা। রোগাক্রান্ত জমির খড় গরুকে খাওয়ানোর জন্য বাড়িতে স্তুপ দিয়ে না রেখে বরং পুড়ে ফেলা ভাল, কারণ এ খড় কৃমি বহন করে ও পরে বৃষ্টির পানির সাথে জমিতে গড়িয়ে আসে।
- বিকল্প পোষক দমন- জমিতে ঘাস জাতীয় আগাছা, আক্রান্ত ধানের গোড়া থেকে গজানো কুশি বা মুড়ি ধান মুক্ত রাখা।
- জমি শুকানো- যেখানে সম্ভব সেখানে বৎসরের প্রথম বৃষ্টির পর জমি চাষ দিয়ে ১৫-২০ দিন শুকানো।
- শস্য পর্যায়- জমিতে ধান ছাড়াও অন্যান্য ফসলের চাষ করা।

খ) রোগাক্রান্ত মাঠে করণীয় ঃ

- পরিচর্যা পদ্ধতি- বীজতলা থেকে উফরা আক্রান্ত চারা বেছে জমিতে সুস্থ চারা লাগানো।
- রাসায়নিক পদ্ধতি- পূর্ববর্তী ফসল যদি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে তবে জমি তৈরীর শেষ সময়ে ফুরাডান ৫জি অথবা কুরাটার ৫জি বিঘা প্রতি ২.৫-৩.০ কেজি প্রয়োগ করে চারা লাগানো।
- যদি চারা লাগানোর পর কুশি পর্যায়ে উফরা রোগ দেখা যায় তবে উপরোক্ত কৃমিনাশক গুলি বিঘা প্রতি ২.৫-৩.০ কেজি হারে প্রয়োগ করেও ভাল ফলন পাওয়া যায়।

- উফরা আক্রান্ত এলাকায় প্রতি কাঠা বীজতলাতে ১৫০ গ্রাম উপরোক্ত কৃমি নাশক গুলি ছিটিয়ে দিয়ে বীজ বুনলে চারাতে এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অথবা আক্রান্ত বীজতলাতেও উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী কৃমিনাশক ব্যবহার করা যায়।

- চারা আক্রান্ত হলে, লাগানোর ১২-২০ ঘন্টা আগে বীজতলা থেকে উঠিয়ে তার শিকড় কৃমি নাশকের ১.৫% দ্রবণে (এক লিটার পানিতে ১৫ গ্রাম কৃমি নাশক) ১০-১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে লাগানো।

টুংরো (Tungro)

টুংরো ধান গাছের ভাইরাস জনিত একটি মূখ্য রোগ। বাংলাদেশে ১৯৬৯ সালে আউশ ও আমন ধানে সর্ব প্রথম রোগটি সনাক্ত করা হয়। অনেক এলাকায় এ রোগকে লোনা ধরা, বসে যাওয়া, লাল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। গাছের চারা অবস্থা থেকে থোড় আসা পর্যন্ত যে কোন বয়সে এ রোগের আক্রমণ হতে পারে, তবে অল্প বয়সে আক্রমণ হলে ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশি হয়।

রোগের গুরুত্ব

সাধারনত আউশ ও আমন মৌসুমে রোগটি বেশি ক্ষতি করে থাকে। বোরোতে এ রোগের আক্রমণ তেমন একটা হয় না বললেই চলে, হলেও ব্যাপক আকারে হয় না। এর কারণ ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী মাসে এ রোগের একমাত্র বাহক পোকা সবুজ পাতাফড়িং এর বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার খুব সীমিত থাকে। তবে আগাম অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর বীজতলা করলে বোরো ক্ষেতেও টুংরো হতে পারে। আক্রান্ত এলাকা সমূহের মধ্যে চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং বৃহত্তর বরিশাল উল্লেখযোগ্য। মৌসুমের প্রথম থেকেই মাঠে পর্যাপ্ত বাহক পোকা এবং রোগের উৎস থাকলে এ রোগের আক্রমণে মাঠের ব্যাপক ফসলহানি হয়ে থাকে।

রোগের কারণ

রাইস টুংরো ভাইরাস নামক এক ধরনের অতি সূক্ষ্ম জীবাণু দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। সবুজ পাতাফড়িং (ছবি ২২) আক্রান্ত গাছ থেকে ভাইরাস সংগ্রহ করে সুস্থ গাছে ছড়ায়, ফলে সুস্থ গাছ আক্রান্ত হয়।

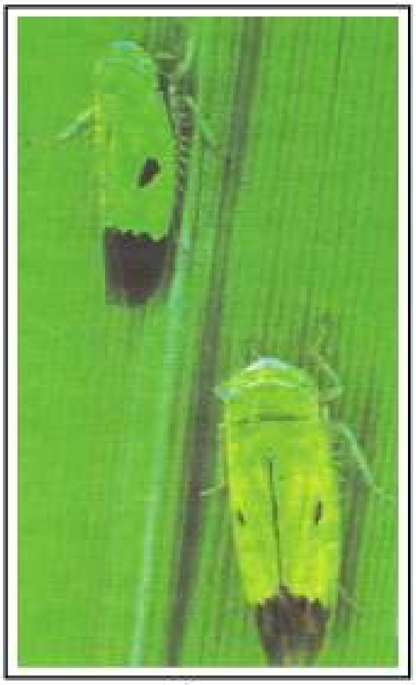

ছবি ২২

রোগের বাহক ও বিস্তার

সবুজ পাতাফড়িং নামক বাহক পোকা এ রোগের সংক্রমণ ঘটায়। বাহক পোকা আক্রান্ত গাছ থেকে ২-৩ মিনিট কাল রস শোষণ করেই ভাইরাস সংগ্রহ করতে পারে এবং তা পরবর্তী ২-৩ মিনিটে সুস্থ গাছে রস শোষণ কালে সংক্রমণ করতে পারে। ফলে সুস্থ গাছটিতেও ২-৩ সপ্তাহের মধ্যেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

টুংরো রোগের উৎস

টুংরো আক্রান্ত গাছ এ রোগের প্রধান উৎস। একবার কোনো মাঠে টুংরো হয়ে থাকলে সেখানকার পরিত্যক্ত আক্রান্ত ধান গাছ, আক্রান্ত মুড়ি ধান ও আড়ালী ঘাসে পর্যাপ্ত পরিমাণ টুংরো ভাইরাস থাকে। বাহক পোকা এ সব রোগাক্রান্ত গাছ থেকে ভাইরাস সংগ্রহ করে পার্শ্ববর্তী গাছে ও মাঠে রোগ ছড়ায়।

মাঠে রোগ বিস্তারের অনুকূল অবস্থা

- ক্ষেতের আশেপাশে রোগের উৎস থাকলে।
- ক্ষেতে বা আশেপাশে পর্যাপ্ত বাহক পোকা থাকলে।
- আক্রমণ প্রবণ ধানের চাষ করলে।
- টুংরো আক্রান্ত চারা রোপন করলে।

ধান গাছের আক্রমণ প্রবণ পর্যায়

চারা ও কুশি গজানো অবস্থা।

টুংরো রোগের লক্ষণ

ধানের চারা অবস্থায় সাধারণতঃ এ রোগের আক্রমণ শুরু হয়। প্রথমে পাতায় লম্বালম্বি ভাবে শিরা বরাবর হালকা সবুজ ও হালকা হলদে রেখা দেখা দেয়। পরে আস্তে আস্তে পাতার উপর দিক থেকে শুরু করে ২-৩ দিনের মধ্যেই সমস্ত পাতা গাঢ় হলদে বা কমলা রঙের (ছবি ২৩) এবং কচি পাতাগুলো হালকা হলদে রঙের ও মোড়ানো হয়ে যায়। কুশি গজানো কমে যায় এবং গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। আক্রান্ত পাতা ও পাতার খোল খাটো হয়ে যায়। নতুন নতুন পাতার গোড়া একই সমান্তরালে অথবা পুরাতন পাতার খোলের মধ্যে আটকা পড়ে থাকে ফলে গাছ বাড়তে পারে না ও খাটো দেখায় (ছবি ২৪)।

ছবি ২৩

ছবি ২৪

অনেক সময় আক্রান্ত পাতা খাটো ও চওড়া হয় এবং আক্রান্ত পাতা ও কান্ডের মধ্যবর্তী কোণ বেড়ে যায়। আক্রান্ত জমিতে বাহক পোকা, সবুজ পাতাফড়িং এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রোগপ্রবণ জাতের ধান হলে ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশি হয়ে থাকে। গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার তারতম্যের কারণে কোনো কোনো জাতের ধানে রোগের মাত্রা প্রকট হয়, আবার কোনো কোনো জাতে হালকাভাবে লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং এ কারণে ফসলের ক্ষতির পরিমাণও কম-বেশি হয়ে থাকে। এ রোগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষেতের সমস্ত গাছই (১০০%) এক সঙ্গে আক্রান্ত হয় না, কারণ বাহক পোকাগুলো সমস্ত গাছেই এক সঙ্গে বসে না। যে সব গাছে বাহক পোকা বসে এবং ভাইরাস সংক্রামণ করে শুধু সে সব গাছেই টুংরোর লক্ষণ প্রকাশ পায়। এমনকি আক্রান্ত গাছের সঙ্গে সুস্থ গাছ লেগে থাকলেও (ছবি ২৫)। বাহক পোকা ব্যতিত টুংরো ভাইরাস সংক্রামিত হয় না এবং রোগটি ছড়ায় না।

ছবি ২৫

এক নজরে টুংরো রোগের লক্ষণ

- গাছ হলদে অথবা কমলা বর্ণের হয়।
- গাছ খাটো হয়ে বসে যায়।
- গাছের কচি পাতা হলদে, চওড়া, খাটো বা মোচড়ানো হয়।
- আক্রান্ত পাতাগুলো ভূমির দিকে নুয়ে পড়ে।
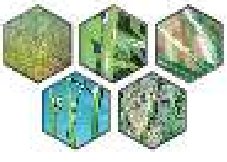
ধানের টুংরো রোগ সনাক্ত করার মত জটিলতা অন্য কোন রোগের ক্ষেত্রে হয় না এবং ধানের জাত ও গাছের বয়সের ভিন্নতার সঙ্গে টুংরো লক্ষণও কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন কারণে ধানগাছের পাতার রং ও গাছের অবস্থা টুংরো আক্রান্ত গাছের মত দেখায় যেমন ক) মাটিতে নাইট্রোজেন বা সালফার সারের অভাব হলে, খ) রাসায়নিক বিষক্রিয়ায়, গ) মাটির লবণাক্ততায়, ঘ) শীতের প্রভাবে ইত্যাদি। এসব কারণে ধান গাছের রং টুংরোর মত হলদে হলেও বেশ কিছু স্পট ও আলাদা লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় যা টুংরোর বেলায় দেখা যায় না। বিশেষ করে উপরে উল্লেখিত কারণে আক্রান্ত জমির শতকরা ১০০ ভাগ গাছের পাতা হলদে হয়ে যায় কিন্তু টুংরোর বেলায় গাছ বিক্ষিপ্ত ভাবে হলদে হয়ে যায়।